সমকাল

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অপুষ্টির শিকার খুলনার ১১শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী

মোঃ মেহেদে হোসেন, খুলনা ঘুরে

আমডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী উর্মি। বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বৃদ্ধি হয়নি। বাড়েনি স্বাস্থ্য ও ওজন। শিশু উর্মি প্রায় প্রতিদিনই সকালে না খেয়ে স্কুলে যায়। দিনভর অভুক্ত অবস্থায় ক্লাস করে। বিকালে সে বাড়ি ফেরে। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত তাকে দুই কিলোমিটারের পথ হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। অভুক্ত থাকা ও দীর্ঘ পথ হাঁটার পর ক্লাস করার কারণে কখনো মাথা ঝিম ঝিম করে। পড়াশোনায়ও তার মন বসে না। খুলনার রূপশা উপজেলার শুধু উর্মিই নয়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এ অঞ্চলের অনেক শিশুকেই অভুক্ত অবস্থায় সকালে স্কুলে যেতে হয়। তার অভুক্ত থেকেই সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সোয়া ৪টা পর্যন্ত স্কুল করতে হয় তাদের। খুলনা মহানগরী ও জেলার ৯টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মাঝে এ অবস্থা বিরাজমান। প্রায়ই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে আসার পর মাথায় ঝিমঝিম ভাবসহ নানা অসুস্থতার কারণে শিক্ষার্থীরা চলে যায়। খুলনার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের এডিপিইও শেখ ওয়াহিদুল আলম জানান, জেলায় বর্তমানে ১ হাজার ১২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিশুই দরিদ্র পরিবারের। এরা অনাহারে থাকার কারণে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। অভাব-অনটনের পাশাপাশি পুষ্টি-অপুষ্টি সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটছে না। তাই দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ২২৮টি স্কুলের মতোই শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে মহানগরীসহ খুলনার অন্যান্য উপজেলায়ও মিড ডে ব্যবস্থা এবং অভিভাবকদের পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলায় মিড ডে ব্যবস্থা চালু থাকায় শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এ দুটি উপজেলার শিক্ষার্থীরা এখন তেমন একটা অসুস্থ হয় না। অপুষ্টিহীনতা থেকেও শিশুরাও মুক্ত হচ্ছে। স্কুলগুলোতে উপস্থিতির হার অনেক বেড়েছে। অল্পে গত দুই বছরে ঝরে পড়ার হারও এ দুটি উপজেলায় হ্রাস পেয়েছে। মিড ডে ব্যবস্থার পাশাপাশি অভিভাবকদের পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এমন সাফল্য লাভ করা যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এত কিছুর পরও পানির সংকটের কারণে অনেকে অতিক্রম-শিকার হচ্ছে। জানা গেছে, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু করা হয় মিড ডে ব্যবস্থা। যা বর্তমানে দেশের ৭২টি উপজেলায় চালু রয়েছে। এর মধ্যে ৪২টিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ৩০টিতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় চলছে। খুলনার দুটি উপজেলায় বিশ্ব খাদ্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এই মিড ডে ব্যবস্থা চালু হয়েছে। খুলনা মহানগরসহ অবশিষ্ট ৭টি উপজেলা এলাকায় দীর্ঘদিনেও এই মিড ডে ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। এর ফলে এসব এলাকায় শিক্ষার প্রতি অনীহা ও প্রাথমিকেই ঝরে পড়ার হারও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ২২৮টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিড ডে হিসেবে পাচ্ছে পুষ্টিকর বিস্কুট। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ থাকছে ৭৫ গ্রামের একটি করে প্যাকেট। কিন্তু বিস্কুট যাওয়ার পর শিশুরা পায় না পর্যাপ্ত পানি। এ ছাড়া এই দুটি উপজেলার স্কুলগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে এ দুটি উপজেলায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মহানগরসহ জেলার ৮টি উপজেলার ৮৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও এ মিড ডে ব্যবস্থা ও পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ জেলায় স্কুলগুলোতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধের হার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। জেলার এ হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের কারণে দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার সাফল্য ম্লান হচ্ছে। মহানগরীর দোলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শান্তিলতা মুন্সি জানান, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সোয়া ৪টা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে ৮-৯ বছরের একটি শিশুর জন্য ক্লাস করা আসলেই কষ্টকর। তার ওপর এখানকার অধিকাংশ শিশুই দরিদ্র পরিবারের। এসব শিশু বাড়িতেও ঠিকমতো খাবার পায় না। এ কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। টিফিন বিরতির পরে অনেকেই স্কুলে ফেরত আসে না। স্কুলের দীর্ঘ সময়সূচির পরিবর্তন করাসহ দুপুর পর্যন্তের সময় রেখে সহর অঞ্চলেও শিশুদের নিয়তে দিন ব্যবস্থা চালু করা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। খুলনার নয়রুপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা বালা জানান, তার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী কবিতা (১৩)। প্রথম যতদূর টেনে ভালো ফলাফল করেছে সে। কিন্তু অভাব-অনটনে থাকা পারিবারিক চাপে লেখাপড়া ছেড়ে সে এখন হাটের সংসারে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে প্রতিবেশী আগরবাতি বিক্রেতা দুলালের (৩৫) সঙ্গে। তিনি বলেন, বটিয়াঘাটাতে অভাব-অনটনসহ সচেতনতার অভাব থাকায় প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, এ অবস্থায় খাদ্যাভাব দূরীকরণের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অপুষ্টিবন্ধন প্রদান বন্ধের জন্য তেমনিভাবে প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ।

জেলার স্কুলগুলোতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধের হার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ